বিষ্ণু দে

জন্ম : ১৮ই জুলাই ১৯০৯ — মৃত্যু: ৩রা ডিসেম্বর ১৯৮২

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রপরবর্তী যে কবিকূল দেখা দিয়েছিলেন বিষ্ণু দে ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম; বস্তুত: প্রধানতমদের একজন। বয়সের হিসাবে এঁরা সকলেই ছিলেন বিংশ শতাব্দীর সমানবয়সী। এঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ জীবনানন্দ দাশ জন্মেছিলেন ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে, এবং সর্বকনিষ্ঠ বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে জন্মেছিলেন যথাক্রমে ১৯০৮ এর নভেম্বর এবং ১৯০৯ এর জুলাইমাসে। এঁদের মাঝখনে আছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও অমিয় চক্রবর্তী। এই পাঁচ প্রধান কবির প্রত্যেকেই ছিলেন ইংরাজি ভাষায় কৃতবিদ্য, প্রাচীন ও আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন, এবং পেশায় ইংরাজি সাহিত্যের বা তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক। বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্য তাঁরা অধিগত করেছিলেন খুব ভালোভাবে। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের থেকে আলাদা পথে হাঁটতে চাইলেও প্রত্যেক দিলেন গভীরভাবে রবীন্দ্রনাথে নিমগ্ন। এত সব মিল থাকা সত্বেও এঁদের প্রত্যেকের বক্তব্যে ও ভঙ্গীতে ছিল আলাদ আলাদা বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকের কাব্যভাষা ছিল একেবারেই নিজস্ব ও মৌলিক, এতদূর পর্যন্ত বিশিষ্ট যে নাম না দেখে বা না জেনেও যদি বিদগ্ধ পাঠক কবিতাগুলি পড়েন তিনি তৎক্ষণাৎ বলে দিতে পারবেন কোনটি কার লেখা।

এঁদের মধ্যে বিষ্ণু দে র খ্যাতি জুটেছিল 'দুরুহতম কবি' বলে।

বিষ্ণুদের ব্যক্তিগত জীবন সরল, একমুখী, ও ঘটনাবিরল। তাঁর জন্ম হয়েছিল উত্তর কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই। অভিজাত্যের যেগুলি সদর্থক দিক অর্থাৎ বিত্ত, বিদ্যা, রূপ, রুচি ও পরিশীলিত ব্যবহার সবই তিনি জন্মসূত্রেই পেয়েছিলেন। নিজেও ছিলেন মেধাবী। প্রথমে সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে, তারপর সেন্ট পল্‌স্ কলেজ, অবশেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি লেখাপড়া করেছিলেন। পাঠান্তে প্রথমে রিপন কলেজে (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) তিনি অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ঐ সময় রিপন কলেজে তিনি সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলেন পূর্বপরিচিত বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্তকে। সঙ্গে আরও ছিলেন সে কালের উদীয়মান কিছু সাহিত্যিক যেমন প্রমথনাথ বিশি বা ধূর্জটিপ্রসাদের ভাই বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ছাত্রদের মধ্যে মিশে ছিল ভবিষ্যৎকালের কিছু কবি। যদিও তখনও তাঁরা কবি হিসাবে পরিস্ফুট হন নি, যেমন গোলাম কুদ্দুস, মনীন্দ্র রায়, অরুণ সরকার বা নরেশ গুহ। মোটের উপর রিপন কলেজের পরিবেশ আপাতদৃষ্টিতে ভালই ছিল। কিন্তু গোলমাল ছিল অন্যত্র। কুশ্রী অপরিসর বাড়ি, অসংখ্য ছাত্র, এবং নিরন্তর কোলাহলে পড়াশুনার পরিবেশ ওখানে ছিল না বলেই কারো কারো মনে হত। অন্তত বুদ্ধদেব বসুর মনে হয়েছিল এ এক বিদ্যের বাজার। ''এক কুশ্রী পরিবেশে বিশুদ্ধ ব্যবসাদারি আবহাওয়ায় - অনুশীলনহীন, উৎসাহরহিত, শুধু পাশ করা আর পাশ করানোর কঙ্কালসার উদ্দেশের মধ্যে আবদ্ধ।'' হয়ত বিষ্ণু দে রও সেইরকম মনে হয়েছিল। যে কারণে অল্পদিন পরে তিনি এখান থেকে চলে যান, এবং অল্পদিন করে প্রেসিডেন্সি ও কৃষ্ণনগর কলেজে পড়াবার পর স্থিত হন ইসলামিয়া বা মৌলানা আজাদ কলেজে। এখানেই তাঁর কর্মজীবনের শেষ পর্যন্ত অতিবাহিত হয়েছিল।

তবে এ সব তো অনেক পরের কথা। অপাতত : ফিরে যাই বিষ্ণু দের ছাত্রজীবনের কালে যখন থেকে কবি হিসাবে তাঁর আত্মপ্রকাশ। ঐ সময়টায় বাংলা সাত্যি একগুচ্ছ সাহিত্যিক নতুন নতুন পরীক্ষায় রত হয়েছেন। কলকাতায় তাঁদের অন্যতম মুখপত্র হিসাবে বেরোচ্ছে কল্লোল পত্রিকা। ঢাকায় বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত মিলে বার করেছেন প্রগতি। কল্লোল ও প্রগতি দুই পত্রিকাই বিষ্ণু দের নতুন ধরণের লেখাকে সাদরে বরণ করে নিয়েছিল। বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিকথা আমার যৌবন থেকে বিষ্ণু দের সেই সময়কার সাহিত্য চর্চা এবং তাঁর বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামত নিয়ে স্মরণযোগ্য কিছু কিছু খবর পাওয়া যায়। আগে সেগুলির কথা বলা যাক।

ঢাকা থেকে যখন প্রগতি বেরোচ্ছে তখন বিষ্ণু দে কলেজের ছাত্র। প্রগতিতে তিনি অনেকগুলি লেখা দিয়েছিলেন। —''প্রথমে শ্যামল রায় বা অমনি কোনো ছদ্মনামে, তারপর স্বনামে পাঠালেন আড়াই পৃষ্ঠার একটি কবিতা (ডলুটা যখন ন্যাকামি করে); কথ্যভাষায় প্রবহমান মাত্রাবৃত্তে সুস্বাদু হালকা চালে হাসির ছটায় চমক লাগানো। এর পর ট্রিয়োলেট গুচ্ছ, কিছু গদ্য রচনা, কোনো এক সময়ে তাঁর দুটি গল্পও বেরিয়েছিলো মনে পড়ে। কৌতুক এই, মিতাক্ষর বিষ্ণু দে নামটিকেও অনেকে প্রথমে ছদ্মনাম বলে ধরে নিয়েছিলেন।'' (আমার যৌবন : বুদ্ধদেব বসু)

তখনও বিষ্ণু দে তাঁর নিজস্ব কাব্যভাষা পুরোপুরি গড়ে তোলেন নি। কিন্তু অচিরকালের মধ্যে তা হয়ে গিয়েছিল। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ উর্বশী ও আর্টেমিস বেরোল তখনই বোঝা গেল তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীটি ঠিক কেমন। উর্বশী ও আর্টেমিসের কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল অনেকদিন ধরে সেই ১৯২৮ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত। এই পাঁচ বছর তাঁর গড়ে ওঠার সময়। তখনও বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকা প্রকাশিত হয় নি। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে যখন তা প্রকাশিত হল তখন তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ চোরাবালির কবিতাগুলি লেখা হচ্ছে। যে ভঙ্গী দিয়ে আমরা বিষ্ণু দে কে চিনি ততদিনে তাঁর সেই কাব্যভাষা পুরোপুরি তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই সময়টিই তাঁর কবিজীবনের উত্থানপর্বের শীর্ষবিন্দু বা Climax। পরবর্তীকালে তিনি আরো অনেকগুলি কবিতার বই লিখেছেন বটে কিন্তু লক্ষনীয় কোনো বড় পরিবর্তন আর তাঁর রচনায় ঘটে নি। এই সময় কল্লোল সহ বাংলায় অনেক সাময়িক পত্রেই তাঁর লেখা প্রকাশিত হচ্ছিল। এবং সম্ভবত: রবীন্দ্রনাথও তাঁর সে সব লেখার কিছু কিছু ইতিপূর্বেই দেখেছিলেন।

সৃষ্টিসন্ধান

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় প্রথম শুধু কবিতার পত্রিকা কবিতা প্রকাশিত হল। বিষ্ণু দে এখানকার প্রধান লেখকদের একজন। কবিতার প্রথম সংখ্যা পড়ে রবীন্দ্রনাথ যে উত্তরটি সম্পাদকের দপ্তরে পাঠিয়েছিলেন সেখানে বিষ্ণু দে বিষয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— বিষ্ণুদের কবিত্বশক্তি আছে। কিন্তু তাকে মুদ্রাদোষে পেয়েছে — সেটা দুর্বলতা। বিদেশি পৌরাণিক বা ভৌগোলিক উপমা কোনো বিশেষ কবিতার অনিবার্য প্রাসঙ্গিকতায় আসতেও পারে, কিন্তু এগুলি প্রায়ই যদি তার রচনায় পরিকীর্ণ হয়ে আচমকা হুঁচট লাগতে থাকে তবে বলতেই হবে এটা জবরদস্তি। ঘাটবাঁধানো দিঘির পাশাপাশি পাইনবনের ছবি আমাদের চোখে স্পষ্ট হতে পারে না। সাইকোলিজর আকাঁড়া ইঁরেজি শব্দ বাংলাকাব্যের জঠরে চালান করতে পারো। কিন্তু সেটা হজম না হয়ে আস্তই থেকে যাবে।”

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে সমালোচনার সুর খুবই স্পষ্ট এবং যথেষ্ট কড়া। কিন্তু বিষ্ণু দে যে তাতে বিচলিত হলেন না, নিজের ধরণধারণ বিশেষ পালটালেন না এতেই আমরা খুঁজে পাই তাঁর আত্মবিশ্বাস এবং নিজস্ব চারিত্র্য। দেশি বিদেশি অজস্র পুরাণপ্রতিমার ব্যবহার এবং দুরূহ শব্দবন্ধ বিষয়ে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট। তিনি মনে করেন ‘‘কাব্য সম্বোধন। সম্বোধনে শ্রোতার সম্বন্ধ গ্রাহ্য।” এই জটিল উক্তির ভিতরকার কথাটি হল কবিতা হল লেখকে পাঠকে সংকেতের বিনিময়। তাই লেখকের ভাষা পাঠককেও জানতে হবে। অনুরূপ মনোভাব বিষ্ণুদের সমসাময়িক অন্যান্য কবিদেরও অল্পবিস্তর ছিল। দুর্বোধ্যতার অভিযোগ আধুনিক কবিতার জন্মলগ্ন থেকে কবিতার গায়ে সেঁটে গেছে। কাজেই বিষ্ণু দের প্রতি যে অভিযোগ উঠছে তা তাঁদের জন্যও ওঠে। তাই সকলেই মনে করতেন পাঠকের দিক দিয়েও কিঞ্চিৎ প্রয়াসের দরকার আছে। জীবনানন্দ দাস বলেছিলেন ভিড়ের হৃদয় পরিবর্তিত হওয়া দরকার। সুধীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে দুর্বোধ্যতার জন্ম পাঠকের আলস্যে তার জন্য কবিকে একা দায়ী করা অনুচিত। বস্তুত: এ কথা সর্ববাদিসম্মত সত্য যে শিল্পকলার সব বিভাগেই স্রষ্টার ভাষাকে বুঝতে গেলে ঐ বিষয়ে কিছুটা প্রাথমিক জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। তাহলে স্থাপত্য ভাস্কর্য সঙ্গীত চিত্রকলায় যদি শিক্ষা ব্যতীত মর্ম অধরা থেকে যায়, সাহিত্য কি তার ব্যতিক্রম হতে পারে? কেনই বা তা ধর্মশালার মত সর্বমানবের কাছে দরজা খুলে রেখে দেবে? বিষ্ণু দে তাঁর ভাষা বদলান নি।

কাব্যভাষা তো সামগ্রিক ব্যক্তিত্বেরই একটা অংশ। কেমন ছিলেন বিষ্ণু দে জীবনের ঐ উঠতি পর্বে। আবার আমাদের শরণাপন্ন হতে হয় বুদ্ধদের বসুর— ‘‘কলকাতায় আমার আর একটি গ্রন্থি হয়েছিলেন বিষ্ণু দে — সেই মূহূর্তের তরুণতম উদীয়মান। তখন তিনি আই এ ক্লাসের ছাত্র, কিন্তু দেখতে অনেক বড়ো মনে হয়— তাঁর মুখের ভাবটি পরিণত, দীর্ঘ দেহ নিয়ে ঈষৎ কুঁজো হয়ে আস্তে পথ চলেন। কোকিল পাড় কাঁচি ধুতি পরেন মস্ত কোঁচা লুটিয়ে, পায়ে থাকে তালতলার চটি, কথা বলেন মৃদু গলায় মৃদু হেসে, নাগরিক ধরেন বিদগ্ধ ও শৌখিন তাঁর ব্যক্তিত্ব। তাঁকে প্রায়ই দেখা যায় সন্ধের দিকে কলেজ স্কোয়ারের রাস্তায় — ফিরছেন বুক কোম্পানিতে একরাশি নতুন বই কিনে, বা গোলদিঘিতে হাওয়া খেতে যাচ্ছেন। তাঁর পরিবার কলকাতার বনেদি, আমাদের মতো স্বপ্নবিত্ত নয়। তাঁদের সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়িতে তাঁর আছে একটি আলাদা বৈঠকখানা, আর সংলগ্ন একটি পড়ার ঘর। সেখানে বই ভর্তি উঁচু উঁচু আলমারি দেখে। তাঁর বয়সের কথা ভেবে আমি বিস্মিত হই। সাহিত্য ছাড়া তাঁর আর একটি উৎসাহের বিষয় চিত্রকলা — সে সময়ে কাণ্ডিনস্কি বা অন্য কোনো অত্যাধুনিক শিল্পী বিষয়ে একটি ছোট প্রবন্ধ লিখেছিলেন বিচিত্রায় আমি আমার অজ্ঞতাবশত: কিছু বুঝতে পারিনি। কিন্তু সেটিই বোধহয় আধুনিক য়োরোপীয় চিত্রকলা বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম আলোচনা।” (আমার যৌবন : বুদ্ধদেব বসু)

এই বর্ণনা প্রাক্ যৌবন বিষ্ণু দের। পরে পরিণত জীবনে তাঁর অধীত বিদ্যার পরিধি বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল। চিত্রকলা বিষয়েও চর্চা করেছেন অনেক। শিল্পী যামিনী রায়ের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় গড়ে উঠেছিল। তাঁর বিষয়ে বইও লিখেছিলেন। যাই হোক পূর্ণশক্তি নিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক বিষ্ণু দে যখন কবিতার আসরে নামলেন তখন তাঁর এতাবৎকালের অধীত বিদ্যার সুবাদে কাব্যভাষায় মিশে গেল রাশি রাশি সাহিত্যিক চিত্রকল্প, দেশি ও বিদেশি, প্রাচীন ও আধুনিক সব ধরনেরই। এই পুরাণপ্রতিমার দ্বারা বক্তব্যনির্মাণ বিষ্ণু দের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থটির নামই হল উর্বশী ও আর্টেমিস (১৯৩৩)। নিখিল পুরুষের কামনার ধন যদি হন উর্বশী, তাহলে ঠিক তার বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে আছেন বীর্যরতী নিষ্কামচিত্ত গ্রীক দেবী আর্টেমিস। এই নামকরণ দিয়ে কবি কি বলতে চান যে নারীর এই দুই রূপই সত্য, এবং এই দুই রূপই তাঁর প্রিয়। এই প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকে শেষ রচনা উত্তরে থাকে মৌন (১৯৭৭) পর্যন্ত তাঁর সমগ্র কাব্যরচনা জুড়ে কত যে পৌরানিক ঐতিহাসিক চরিত্র ও বিষয়ের যাতায়াত তার সীমা নেই। যেমন আছে ট্রিস্টান, ইসোল্‌ভি, স্যার্সি, হেলেন, ক্লিওপেট্রা, ভিনাস প্রভৃতি পাশ্চাত্য বিষয়; তেমনই আছে প্রাচ্য দেশের সুভদ্রা, পার্থ, কৃষ্ণ, কলি, পরীক্ষিৎ, কুরুক্ষেত্র, রাবণ, মারীচ, কল্কি, বৈতরণী, ঈশাবাস্যমিদং (উপনিষৎ) প্রভৃতি। আছে রূপকথার সাতভাইচম্পা ও পারুল বোন, পক্ষীরাজ ঘোড়া ও বর্শাধারী রাজকুমার মনপবনের নাও ও সাতসমুদ্র তেরো নদীর পার। আছেন অবিরল ভাবে রবীন্দ্রনাথ শুধু বাক্যাংশ বা চরিত্রউল্লেখে নয়, মাঝে মাঝেই রবীন্দ্রনাথ থেকে গোটা একটি বা দুটি পংক্তি তিনি আপন কবিতার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাতে রবীন্দ্রনাথের থেকে তাঁর বিপরীত বক্তব্যের অভিঘাতটা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হতে পেরেছে। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন মধুসূদনও বাদ যাননি। বাঙ্গালী পাঠকের কাছে রামায়ন মহাভারত বা রবীন্দ্রনাথের অনুষঙ্গগুলি পরিচিত হলেও বিদেশি সাহিত্য, গ্রীক ও রোমক পুরানের অপ্রধান উপাখ্যান ও চরিত্র পরিচিত না হওয়ার ফলেই অনেক সময় তাঁর চিত্রকল্প বুঝতে অসুবিধা হয়। দেশীয় অনুষঙ্গগুলির মত তাদের

সৃষ্টিসন্ধান

উল্লেখমাত্র কবির বক্তব্য সরাসরি আমাদের চেতনায় গিয়ে ধাক্কা দেয় না। হয়ত সেইজন্যই তাঁকে মনে হয় দুরূহ। কিন্তু বাঙ্গালী পাঠকের এখানে কিছু করার নেই। তার বিষয়ে কবির অভির'ায় খুব স্পষ্ট। তিনি তাঁর পাঠকের কাছে দাবি করেছেন সেই অভিনিবেশ যার দ্বারা সে অভিধান খুলে জেনে নেবে কোন অনুষঙ্গের কী অর্থ। পাঠকের আলস্য তাঁর কাম্য নয়। কয়েকটি উদাহরণ।

১। লাল মেঘে ঠেলে নীল মেঘ। নীলে ধোঁয়া মেঘেদের ভিড়
মেঘে মেঘে আজ কালো কল্কির দিন হোলো একাকার
বিদ্যুৎ নেভে ঈশানবিষানে, বজ্রও দিশাহারা
এলোমেলো পাখা ঝাপটি তবুও ওড়ে কথা ক্রেসিডার।
— ক্রেসিডা

২। আজো তাই লাবণ্যের ঘরে
সন্ধ্যার কবিত্বময় কোমল আলোয়
ট্রিস্টান ও ইসোল্ডের রোমাঞ্চনিবিড় সুরে সঙ্গীতমায়ায়
মগ্ন হয়ে বাক্যহীন আমি রই চেয়ে।
হে স্যর্সি বেঁধেছ মোরে, আরো, বাঁধো
আমি ভালোবাসি
তোমায় সর্পিল কেশ, নিমীলনীলিম তব চোখ।
উর্বশী ও আর্টেমিস।

৩। চম্পা, তোমার মায়ার অন্ত নেই
কত না পারুলরাঙানো রাজকুমার
কত সমুদ্র কত নদী হয় পার।
বিরাট বাংলাদেশের কত না ছেলে
অবহেলা সয় সকল যন্ত্রনাই
চম্পা কখন জাগবে নয়ন মেলে।
সাত ভাই চম্পা।

৪। পাঁচ মিনিট, পাঁচ মিনিট মোটে
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাত্ত
উদ্দাম উধাও
ট্রেন এলো বলে হাওড়ায়
ওপারে স্টক এক্সচেঞ্জের এপারে রেসওয়ের হাওড়া
তারি মধ্যে বসে আছেন শিবসদাগর।
ট্যাক্সির হৃৎস্পন্দনে, ট্রাফিকের এটাক্সিয়ার।
টপ্পা - ঠুংরি

বিষ্ণু দের আর একটি বৈশিষ্ট্য অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য শব্দব্যবহার। এখানে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে শব্দব্যবহারের দুরূহতা সেখানে কিন্তু একা বিষ্ণু দেরই বৈশিষ্ট্য ছিল না। তাঁর সমকালীন কবিরা অনেকেই এ দোষে দোষী ছিলেন, যদিওকাজটাকে আদৌ যদি দোষ বলা হয়। জীবনানন্দ এনেছিলেন কিছু দেশজ ও অপ্রচলিত শব্দ যাদের আগে কবিতায় ব্যবহার ছিল না। আর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে হাত পেতেছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যের কাছে। সংস্কৃত এক আশ্চর্য ঐশ্বর্যবান ও নমনীয় ভাষা। এ ভাষার শব্দনির্মানশক্তি অতুলনীয়। একে তো শব্দে ও ধাতুতে প্রত্যয়যোগে নব নব শব্দ এখানে তৈরি করা যায়; তদুপরি সমাসবদ্ধ পদের দ্বারা শব্দার্থের সীমারেখা বাড়ানো যায় অনেকদূর অবধি। সংস্কৃত ভাষার এই বিপুল সম্ভাববনাকে আগেও অনেক কাজে লাগিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অগ্রগন্য। এবার বিষ্ণু দে এবং সুধীন্দ্র দত্ত ও সে কাজে প্রবৃত্ত হলেন। অনভ্যস্ত পাঠকের কানে শব্দগুলি হয়ত কিঞ্চিৎ অপরিচিত ঠেকে, কিন্তু একটু চিন্তা করে মূল ধাতুটি ভেঙে বুঝে নিলে আর দুরূহ থাকে না। যেমন—

১। তোমার বাহুতে অনন্ত স্মৃতি ক্রতুকৃতমের শেষ। — ক্রেসিডা

২। জানি জানি এই অলাতচক্রে চক্রমন
সোৎপ্রাসপাশে বলি নাকো তাই কথা। — ক্রেসিডা

৩। বুদ্ধি আমার অপাপবিদ্ধমস্নাবির। — ক্রেসিডা

৪। কেটে যায় বিটোফনী সিম্ফনির গন্ধর্ব বাতাস।
— নাম রেখেছি কোমল গন্ধার

সৃষ্টিসন্ধান

৫। কারণ সে দ্বৈতাদ্বৈতে দ্বন্দ্বোত্তর প্রেম এক প্রাণময় বর্ম।

—চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর।

বিষ্ণু দের দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যতম দিক ছিল মার্কসীয় দর্শনে তাঁর নিজস্ব এক ধরনের বিশ্বাস। এ বিশ্বাস ঠিক পার্টিকর্মীর নয়, এর চেহারা ব্যক্তিগত। কাব্যরচনার সূচনাপর্বে কবি ছিলেন ইংরেজ কবি টি এস. এলিয়টের অনুসারী। ক্রমে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলা কালীন মার্কসীয় দর্শনে তাঁর বিশ্বাস জন্মায়। তখন তিনি প্রগতিশীল লেখক শিল্পি সমবায়, 'IPTA' ভারতসোভিয়েত মৈত্রী সংঘ, প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন। ফ্যাসিবিরোধী শিল্পি গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ তো আগে থেকে ছিলই। কাব্যে ও কর্মে তাঁর নবলব্ধ বিশ্বাস তিনি ব্যক্ত করতে থাকেন। এই সব সংযোগ কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ভারত স্বাধীন হবার পরে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি একধরনের গোঁড়া ও উগ্র চিন্তাধারা পোষণ করতে শুরু করেছিল। শিল্পির স্বাধীনতায় তারা বিশ্বাস করত না। বিষ্ণু দের উদার মানবতাবাদী মতামত তাদের বরদাস্ত হয় নি। সরকারি সাম্যবাদি মহল বিষ্ণু দে কে পরিত্যাগ করলে বিষ্ণু দে ও এদের সংশ্রব এড়িয়ে চলতে লাগলেন এবং পরিশেষে নিজস্ব মতামতের বাহন হিসাবে প্রকাশ করলেন সাহিত্য পত্র পত্রিকাটি। অবশেষে বিষ্ণু দে আর গোষ্ঠীভুক্ত মার্কসবাদী রইলেন না বটে কিন্তু নিজের কাছে নিজের মতবিশ্বাসে অবিচল থেকেছেন চিরকাল। মানবেন্দ্র রায়ে মতামতে তার অবস্থা ছিল। তার মত ছিল এই যে পৃথিবীর ইতিহাসে একক প্রয়াসের দিন শেষ হয়েছে। একাকী মানুষ চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে থাকার মতই বিপন্ন। ইতিহাসের গতিপথ এখন সমষ্টির দিকে। যদুবংশের পতনের পর আভীর দস্যুরা যেমন করে লুট করে নিয়ে গিয়েছিল যাদব রমনীদের, তেমনি করেই আজ আমজনতার শক্তি ও সংস্কৃতি অধিকার করে নিচ্ছে পুরনো শান্ত ভদ্র অভিজাত জীবনের যাবতীয় উত্তরাধিকারকে। এটা ভালো কি মন্দ প্রশ্ন তা নয়। সত্য এই যে এটাই বাস্তব। এই বাস্তবকে আমাদের মেনে নিতে হবে, আর মেনে যদি নিতে হয় তাহলে সানন্দে সহর্ষে, তার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে মেনে নেওয়াই ভালো। মোটমুটি এই হল বিষ্ণু দের সমাজচেতনার মর্মকথা।

১। কার পদধ্বনি আসে? কার?
একি এলো যুগান্তর! নব অবতার!
এ যে দস্যুদল!
হে ভদ্রা আমার—
লুব্ধ যাযাবর, নির্ভীক আশ্বাসে আসে ঐশ্বর্য লুণ্ঠনে
দ্বারকার অঙ্গনে অঙ্গনে।
চায় তারা রঙ্গিলাকে প্রিয়া ও জননী
প্রাণৈশ্বর্যে ধনী;
চায় তার ফসলের খেত, দিঘি ও খামার,
চায় সোনাজ্বলা খনি, চায় স্থিতি অবসর
দস্যুদল উদ্ধত বর্বর
আপন বাহুর সাহসী বুদ্ধিতে দৃপ্ত ভবিষ্যে নির্ভর
দস্যুদল এলো কি দুয়ারে?
পার্থ যে তোমার
অক্ষম বিকল ভদ্রা, গাণ্ডীরের সে অভ্যস্ত ভার
আজ দেখি অসাধ্য যে তার।
চোখে তার কুরুক্ষেত্র, কানে তার মত্ত পদধ্বনি।
ক্ষমা কোরো অতিক্রান্ত জীর্ণ অসুয়ারে
ব্যর্থ ধনঞ্জয় আজ, হে ভদ্রা আমার।
পদধ্বনি।

২। জন্মে তাদের কৃষাণ শুনি কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কৃষানের বউ পঁইছে খাড়ু বানায়;
যাত্রা তাদের কঠিন পথে রাখীবাঁধা কিশোর হাতে
রাক্ষসেরা বৃথাই রে নখ শানায়।

নীল কমলের আগে দেখি লালকমল জাগে
তৈরি হাতে, নিদ্রাহারা একক তরোয়াল—
লাল তিলকে ললাট রাঙা উষার রক্তরাগে
কার এসেছে কাল।
সন্দীপের চর।

সৃষ্টিসন্ধান

বিষ্ণু দের সারা জীবন ছিল শান্ত নিস্তরঙ্গ। কর্মজীবনে বা ব্যক্তিগত জীবনে কোথাও কোনো বড় টালমাটালের মুখে তাঁকে কোনদিন পড়তে হয় নি। তাঁর রচনাবলীর পরিমাণও খুব বেশি নয়। মূলত: তিনি কবি, কবিতাই লিখেছেন। গদ্য রচনা যা যৎসামান্য আছে তাও প্রধানত: প্রবন্ধ ও সমালোচনা। সাহিত্য ছাড়াও শিল্পকলার আর যে বিভাগে তাঁর অনুরাগ ছিল তা হল চিত্রকলা। শিল্পি যামিনী রায় ছিলেন তাঁর বন্ধু। যামিনী রায়ের উপর তাঁর একটি বইও আছে। এছাড়া রবীন্দ্রচিত্রকলা নিয়েও তিনি লিখেছেন।

তাঁর স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ কাব্যগ্রন্থটির জন্য ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সাহিত্য অকাডেমি পুরস্কার পান এবং ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে পান জ্ঞানপীঠ পুরস্কার।

তাঁর শেষ বই বেরিয়েছিল ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে। তারপর যদিও তিনি আরও পাঁচ বছর বেঁচে ছিলেন কিন্তু সৃজনশীল আর ছিলেন না। অবশেষে ১৯৮২ খৃষ্টাব্দে ৩রা ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়

বিষ্ণু দের গ্রন্থতালিকা

১৯৩৩	উর্বশী ও আর্টেমিস	১৯৬৯	সংবাদ মূলত কাব্য
১৯৩৭	চোরাবালি	১৯৭০	ইতিহাসের ট্রাজিক উল্লাসে
১৯৪১	পূর্বলেখা	১৯৭৪	ঈশাবাস্য দিবানিশা
১৯৪৪	সাত ভাই চম্পা	১৯৭৫	চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর
১৯৪৭	সন্দীপের চর	১৯৭৭	উত্তরে থাকো মৌন।
১৯৫০	অন্বিষ্ট		যামিনী রায়
১৯৫৩	নাম রেখেছি কোমল গান্ধার	১৯৮৮	The Art of jamini Roy
১৯৫৮	আলেখ্য	১৯৫৮	The Painting of Rabindranath Tagore
১৯৬০	তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ	১৯৫৯	India & Modern Art
১৯৬৩	স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ		In the Sun and the Rain
১৯৬৬	সেই অন্ধকার চাই		History's Tragic Exultation (Yranslation of ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে)

সৃষ্টিসন্ধান